শারদ অর্ঘ্যঃ এইচ এম ভি থেকে প্যারামাউন্ট

কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানীর স্থাপনা হয় আমারও জন্মের প্রায় কুড়ি বছর আগে। তখন ওটার নাম ছিল '' The Gramophone & Typewriter Ltd .'' প্রথমে এর অফিস ছিল ৭ নং এসপ্ল্যানেডে এবং কয়েকবছর ওখানে থাকার পর ১৯০৭ অথবা '৮ সাল নাগাদ ওখান থেকে ওটা উঠে আসে ১৩৯ নং বেলেঘাটা রোডে। এর প্রায় আরও কুড়ি বছর পর ১৯২৯ সালে ওটা পাকাপাকিভাবে উঠে আসে ৩৩ নং যশোর রোডে। HMV এর পাশাপাশি Odion , Bekagrand , Pathey , Nicol ইত্যাদি আরও বিখ্যাত সব রেকর্ড কোম্পানীরও তখন কলকতা সহ্ সারা ভারতেই অনেকগুলো শাখা অফিস ছিল। এগুলো যে সময়কার কথা বলছি , তখন আমার জন্মও হয়নি। কিন্তু লোকমুখে তথা বিভিন্ন নথিপত্র থেকে জেনেছি যে এদেশে যে বছর থেকে কলের গানের প্রচলন হ'ল , প্রায় সে বছর থেকেই নাকি ''শারদ অর্ঘ্য'' অর্থাৎ বাঙ্গালীর প্রধান উৎসব দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাংলা গানের বিশেষ শারদীয় রেকর্ড প্রকাশও চালু হয়েছিল। এসব রেকর্ডের তখন কদরও হ'ত খুব। তখন পূজোর রেকর্ডে যারা গাইতেন , তাদের মধ্যে মানদাসুন্দরী দাসী ,কে.মল্লিক এরা খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯১৬-১৭ সাল নাগাদ আমার কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দের জীবনের প্রথম পূজোর গান - '' আর চলেনা চলে না মাগো'' গানটিও এই এইচ. এম. ভি . থেকেই একদিন বের হয়েছিল। এবং এর প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর ১৯৫৩ তে তারই ভাইপো এই আমার জীবনেরও প্রথম গান - ''কতদূরে আর নিয়ে যাবে বল কোথায় পথের প্রান্ত'' ও প্রকাশিত হয় এই এইচ. এম. ভি. থেকেই। কলের গানের একেবারে সেই শুরুর পর্যায় থেকেই বাঙ্গালী জীবনে'' পূজোর গানের'' একটা অন্যরকম চাহিদা গড়ে উঠেছিল। চাহিদা মানে কি ,পূজোর ফুল-বেলপাতা বা নতুন জামাকাপড়ের মতোই নতুন গানও বাঙ্গালী জীবনের একটা বিশেষ অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। আর শুধু কি রেকর্ড ! রেকর্ডের পাশাপাশি সব গান মিলিয়ে গানের বই বের হত এবং জনপ্রিয় গানগুলোর স্বরলিপি নিয়ে বের হত মাসিক পত্রিকা - ''রেকর্ড সংগীত''। এই সবকিছু মিলিয়ে পূজো মানেই তখন সে এক ফাটাফাটি ব্যাপার। বাংলা গানেরও তখন সে একটা সময়ই গেছে বটে।

হেমন্তবাবু ,শ্যামল মিত্র,ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য,মানবেন্দ্র মুখার্জী,সতীনাথ মুখার্জী, সন্ধ্যা মুখার্জী এরা সবাই তখন প্রতিষ্ঠার মধ্য গগনে। পূজোকে কেন্দ্র করে কী সব ভালো ভালো গানই তখন সবাই গেয়েছেন। আহাঃ !

আমার প্রথম বেসিক বাংলা গান "কতদূরে আর নিয়ে যাবে বল ..." এর রেকর্ড করার যে গল্প আগেই শুনিয়েছি , তাতে ওটাকে সেই অর্থে ঠিক আমার শারদ অর্ঘ্য বলা হয়তো উচিৎ হবে না । সঠিক অর্থে আমার পূজোর গান গাওয়ার সূচনা আরও এক-দু বছর পর " তুমি আর ডেকো না " এবং "তীর ভাঙ্গা ঢেউ আর নীর ভাঙ্গা ঝড়" রেকর্ডটির মধ্য দিয়ে সেই তিপ্পান্ন সাল থেকে এই সেদিন উননব্বই এর পূজো সংখ্যা পর্যন্ত গত ছত্রিশ বছরে অজস্র বেসিক বাংলা গান আমি এই H M V থেকে গেয়েছি এবং এই ব্যাপারে অবশ্যই আমি আজও H M Vর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ আমার গানকে রেকর্ড -ক্যাসেটের মাধ্যমে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার মহান কার্জটাই করে দিয়েছে এই His Master's Voice .

আমার গাওয়া ফিল্মী এবং ননফিল্মী দু- ধারার গানই যদিও শ্রোতারা সমান আগ্রহ নিয়েই আজও শুনতে চায় এবং দু ধারার গানেই আমি নিজে যদিও সমান পরিশ্রমী , সমান সংবেদনশীল এবং সমান উদ্যোগী ছিলাম , কিন্তু এত কিছুর পরও অন্তত সত্যের খাতিরে হলেও বলা দরকার যে ফিল্মী এবং ননফিল্মী - গান হিসেবে বাহ্যত এক মনে হলেও এই দু ধারার গানের মধ্যে অদৃশ্য একটা স্বচ্ছপর্দার উপস্থিতিও যেন বারবারই আমার মনে উঁকি দিয়ে গেছে এবং practically এটাও দেখেছি যে ফিল্মী বা ননফিল্মী গান গাওয়ার সময় এই অদৃশ্য পর্দাটার উপস্থিতির অনুভবের ব্যাপারে আমি সবময়েই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই খুবই সচেতন হয়ে গেছি। ফিল্মী গানের ক্ষেত্রে একটা কথাই খুব স্পষ্ট করে আমার মনে হয়েছে যে এ গান তৈরী হয় ছবির ঘটনার প্রয়োজনে এবং সে গানের বিষয়বস্তু বা বাণী ইত্যাদির পছন্দ- অপছন্দের ব্যাপারে গায়কের স্বাধীনতার তেমন কোন অবকাশই থাকে না , যেমনটা নন-ফিল্মী গানের নির্বাচনের সময় খুবই প্রাধান্য পায়। ফিল্মী গান গাওয়ার সময় গায়কের নিজের রুচি নিজের গায়কী , নিজের উপস্থাপনাবোধ ব্যাপারগুলো যত উল্লেখ্য , তার চেয়েও অনেক বেশী vital factor হচ্ছে ছবিতে যার জন্য গানটা গাওয়া হচ্ছে , সেই চরিত্রের রুচি উপস্থাপনা বোধ , পরিবেশজনিত মেজাজ এবং সেই সব factor এর সাথে গায়কের নিশ্চিদ্র involvement । মেহমুদের জন্য গাইবার সময় মেহমুদ যদি আমার মধ্যে প্রতিবিম্বিত না হ'ত বা উত্তমকুমারের জন্য গাইবার সময় ভোলাময়রা , এন্টনী বা ভাওয়ালরাজারূপী উত্তমকুমারের সাথে আমি যদি একাত্ম হতে না পারতাম ,এমনকি নায়কের স্বভাবজ voice এর পিচ মতো যদি আমার হাই-পিচ ভয়েসকে হেরফের করে না গাইতাম , সেক্ষেত্রে গানের মানদন্ডে সেসব গান উত্তম বিবেচিত হয়েও ছবিতে উত্তমকুমারের লিপে বেমানান হয়ে ফ্লপ নম্বর হতে বাধ্য ছিল। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেএও

বলবো যে নিশ্চিন্তিরও ব্যাপার। কারণ ফিল্মীগান লোকে যে শুধু শোনে তাই নয় সে সঙ্গে দেখেও। অর্থাৎ ঘটনার ভাবটা তারা কোনরকম কল্পনার জাল না বুনেই শুধুমাত্র দেখে ও শুনেই ব্যাপারটা বুঝে যায়। ঘটনাটা অনেকটা যেন ঠিক দূরদর্শন আর আকাশবাণীর পার্থক্যের মতো। আগেকার দিনে আমরা যখন রেডিওতে কোন খেলার ধারা বিবরণী শুনতাম , তখন বিবরণী শুনতে শুনতে খেলার মাঠটাকে , খেলোয়াড়দেরকেও যেন কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেতাম , দেখতে চেষ্টা করতাম। সেক্ষেত্রে আমাদের কল্পনার উৎকৃষ্টতার যেমন একটা ভূমিকা থাকতো , সেই সঙ্গে যিনি বিবরণী দিচ্ছেন তার উপস্থাপনার গুনে " চোখের অবিশ্বাস্যকে বিশ্বরূপের দৃশ্য দেখানোর" আর্টটাও খুব উন্নতমানের হওয়াটাও একান্ত জরুরী হত। অনেকটা যেন ঠিক শ্রুতিনাটকের উপস্থাপনার মতো। কিন্তু আজকাল যখন দূরদর্শনে কোন খেলা দেখি তখন ঐ কল্পনা ব্যাপারটার যেন কোন ভূমিকাই খুঁজে পাই না এবং যিনি বিবরণী দেন, তাঁরও বাচনশৈলীতে যেন সেদিনের সেই উপস্থাপনার গুণপনা দেখানোর সুযোগ প্রায় থাকে না বললেই চলে। Audio system টা বন্ধ করে রাখলেও শুধু visual approach থেকেই যেন ঘটনার অনেকটাই বুঝে ফেলা যায়। ফিল্মী এবং নন-ফিল্মী গানের পার্থক্যটাও বোধ হয় এই একই পর্যায়ের । আমার মনে আছে "দেবদাস" ছবিতে আমাকে দিয়ে যখন 'শাওন রাতে যদি ....' নজরুল গীতিটা গাওয়ানোর কথা হ'ল , তখন আমি ওদেরকে স্পষ্ট বলেছিলাম যে "দেখুন এটা একটা খুবই common নজরুলগীতি এবং নজরুল গীতির যারা অথরিটি , তাঁরা প্রায় সকলেই এই গানটি বিভিন্ন সময়ে রেকর্ড করেছেন।শ্রোতারাও ঐ সমস্ত গায়কের সাথে গানটাকে প্রায় সমার্থক করে ফেলেছে।সেক্ষেত্রে আমার কি এ গানটা গাওয়া আদৌ উচিৎ হবে ?" কিন্তু ওরা শুনল না। আমাকে দিয়েই শেষ পর্যন্ত গানটা গাওয়ালোই। সেই গান শুনে আমার গান যার তেমন ভালো লাগে না তেমন একজন স্পষ্টবক্তা প্রথিতযশা সংগীত -সাংবাদিক তথা সমালোচক যদিও একদিন লিখে ফেলেছিলেন যে " মান্না বাবুর কন্ঠে 'শাওন রাতে যদি ' গানখানি মনকে এমনভাবে ভিজিয়ে দিল যে পার্বতীর জন্য দেবদাসের আকুলতা যেন নিজের অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ করলাম। কোন কাজ বা তান না দিয়েও সটান সোজা সুরে গানের বাণীকে এমন স্পর্শকাতর করে তুলেছিলেন চিন্তা করা যায় ! রং না দিয়েও গানকে কত রঙিন করা যায় ,ঐ গানে ছিল তারই পরিচয় এবং এ স্বাক্ষর রাখতে পারেন মান্না দের মতো শিল্পীরাই। বহুদিন আগে এই গানটি রেকর্ড করেছিলেন সতীনাথ বাবু। কোনদিন ভাবিনি গানটি অন্য কারো কন্ঠে শুনতে এত ভালো লাগবে।" কিন্তু তারপরও নির্দ্বিধায় বলবো যে ছবিতে ওরকম একটা উপযুক্ত পরিবেশে গানটার ওরকম একটা সুন্দর treatment হয়েছিল বলেই অর্থাৎ গানের বিষয় তথা ভাবটাকে ওরকম সুন্দরভাবে

visualise করা হয়েছিল বলেই আপামর দর্শক তথা শ্রোতা কোনরকম কল্পনার জাল বিছানোর কষ্ট না করেও গানটাকে ওরকম গভীরভাবে সেদিন হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল , সেটাকে এত জনপ্রিয় করে তুলেছিল , যেটা এর আগে অত বড় বড় শিল্পীরা এতবার গেয়েও তেমন জনপ্রিয় করতে পারেননি সম্ভবত একমাত্র ভাবের visualisation এর এই অভাবে। এখানেই ফিল্মী ও ননফিল্মী গানের বেসিক পার্থক্য এবং একারণেই বেসিক আধুনিক গানের ক্ষেত্রে গায়ককে একটু বেশীই সাবধান হতে হয়, চিন্তিত থাকতে হয়। বেসিক সঙ্‌ই হোক বা ফিল্মী সঙ্‌ই হোক সবই আসলে সুর -তাল -বাণীর আবেদন মিলিয়ে একটা কোন ঘটনা বা অনুভূতিরই তো ছবি এঁকে যাওয়া। ধরা যাক আমারই গাওয়া "আজ আবার সেই পথেই দেখা হয়ে গেল ....." গানটারই কথা। গানটাতে দৃশ্যত যা আছে , সেটা হচ্ছে এক অনুভূতি প্রবন প্রেমিকের সাথে তারই হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকার হঠাৎই নির্জন পথিমধ্যে দেখা হয়ে যাওয়া এবং এত বছর ধরে বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে ওঠা শিল্পীমনের নানান কাব্যময় ব্যঞ্জনার বহিঃপ্রকাশ। সেলুলয়েডে এই মুহূর্তটা নাটকীয় flash-back ইত্যাদি মিশিয়ে দেখানো হলে সেই দৃশ্যপটটা দেখেই যে কেউ অনুভূতির সামিল হতে পারতো। কিন্তু আমি যখন গানটা করি তখন আমার কাছে কোন ক্যামেরা নেই অথচ সুর -তাল -লয় -ছন্দ -বানী -আবেদন এসব মিশিয়ে সেই মূহুর্তটাকে কল্পনায় দেখানোটাই আমার প্রধান দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। চোখে না দেখেও সেই সূক্ষ্ম অনুভূতি মাখানো মূহুর্তটায় শ্রোতা পৌঁছে যেতে চায় , নিজেকেই গানের দর্পণে নতুন করে আবার একবার দেখে নিতে চায়। এই যে শব্দকল্পের সীমানা ছাড়িয়ে একটা গানকে দৃশ্যকল্পে পৌঁছে দেয়া , এখানেই ফিল্মীগানের সাথে ননফিল্মী গানের একটা বিরাট পার্থক্য।

শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে রাগটাই মুখ্য এবং বাণীটা গৌণ বলে বিবেচিত হলেও আধুনিক গানের ক্ষেত্রে গানের কথা এবং সেই কথাকে যথার্থ dimension এ শ্রোতার হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য কথার ভাবানুসারী যথার্থ সুর , দুটোই যুগপৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যে কারনেই কোন গায়কের সুপ্রতিষ্ঠার পেছনে যথার্থ গুণী গীতিকার ও সুরকারদের অবদান সব সময়ই একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ factor হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আধুনিক গানের ক্ষেত্রে আমার আজকের যতটুকু যা প্রতিষ্ঠা , সেখানেও এই নিয়মই সমানভাবেই সত্য। আমার গাওয়া ফিল্মী ও ননফিল্মী দুই ধারার গানের ক্ষেত্রেই গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান আজ বিশেষভাবেই স্মর্তব্য। প্রথমেই বলবো গৌরীপ্রসন্নর কথা। আমার প্রথম বাংলা ফিল্মী গান অর্থাৎ সেই যে মারাঠী ছবি "অমর ভূপালী" র বাংলা ভার্সানে আমি গেয়েছিলাম - " কোথা মুকুন্দ কেহ না কহিল " এটার গীতিকার যেমন ছিলেন গৌরীবাবু , আবার আমার প্রথম ননফিল্মী বাংলা গান " কতদূরে আর নিয়ে যাবে

বল ... " র গীতিকারও ছিলেন গৌরীবাবু। গৌরীবাবুর লেখা প্রথম থেকেই আমার খুবই ভালো লাগতো। ওনার ভাব, শব্দচয়নের রুচিবোধ, বক্তব্যের গভীরতা এসব গুলো আমায় বরাবরই ওর প্রতি খুব আকর্ষণ করেছে। আমার তো মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ প্রমুখের পর বাংলা গানের জগতে মুষ্টিমেয় যে দু - চারজন মহান গীতিকারের নাম এক সঙ্গে মুখে এসে যায়, তাদের মধ্যে সলিল চৌধুরীর পরই বোধহয় গৌরীবাবুর স্থান। অপরাপর সমস্ত মহান গীতিকারের মতো গৌরীবাবুর গীতিকায়ও স্পষ্ট একটা স্ট্যাম্প থেকে যেত। হাজারো গানের ভীড়েও শুধুমাত্র কোন গানের প্রথম প্যারাটা শুনেই অতি সহজেই বলে দেয়া যেত যেএটা অবশ্যই গৌরীবাবুর গান। তবে ওর গানের বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিষ খুবই স্পষ্ট হয়ে যায় যে সিরিয়াস গানের ক্ষেত্রে উনি যতটা জিনিয়াস, সেই তুলনায় চটুল গানের ব্যাপারে কোনদিনই তেমন পটু ছিলেন না মোটেও। আমার মনে আছে "দীপ জ্বেলে যাই" ছবিতে একজন মাতালের চরিত্রে অনিল চ্যাটার্জীর লিপের জন্য ওঁনাকে যখন একটি গান লিখতে বলা হয়েছিল, শুনে উনি বেশ যেন একটু অপ্রস্তুতই হয়ে গিয়েছিলেন। যেখানে মদ্য, গৌরীবাবু তো সর্বদাই তার থেকে শত হস্ত দূরে অবস্থান করতেন। এ হেন গৌরীবাবুকে যখন মাতালের মাতলামির গান লিখতে বলা হল, তখন বহু কষ্টেই উনি সেদিন লিখতে পেরেছিলেন,- " এমন বন্ধু আর কে আছে..."

সেই দিক থেকে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে আক্ষরিক অর্থেই গ্রেট। " তুমি যদি ময়দা হ'তে " থেকে শুরু করে "জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই " ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্তগানেই পুলকবাবু একেবারে আধুনিক গানের যারা সচেতন শ্রোতা, যারা শুধু গান শুনেই তৃপ্ত হননা, গান নিয়ে ভাবেনও, ভাবেন গানের সুরকারদেরকে নিয়ে, গীত রচয়িতাদেরকে নিয়েও, তাদের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন গীতিকার হিসেবে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গৌরীপ্রসন্নর মধ্যে কে বড়, কার গান গাইতে আমার বেশী ভাল লাগে, ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন। এধরনের কোন তুলনামূলক প্রশ্ন শুনলে সবসময়ই আমি কেমন যেন খুব বিব্রত বোধ করেছি। শুধু এদেরকে নিয়েই নয় ক্লাসিকাল গান বাজনার ক্ষেত্রে করিম খাঁ বড় না ফৈয়াজ খাঁ বড়, এমন তর প্রসঙ্গ নিয়েও শ্রোতারা একসময় নিয়তই চায়ের টেবিলে যুক্তি - পাল্টা যুক্তির ঝড় তুলতেন। আমার মনে আছে কোথায় যেন একবার পড়েছিলাম রবিশঙ্কর বড় না আলি আকবর বড়, এই নিয়ে কোন একজন সাংবাদিক আলি আকবর খাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করলে পর খাঁ সাহেব নাকি মুচকি হেসে তুরন্ত জবাব দিয়েছিলেন - 'রবিশঙ্কর'। তরপর একটু থেমে আবার বল্লেন,- "রবি বয়সে আমার চেয়ে দু - তিন বছরের বড়। কিন্তু বয়সে উনি আমার থেকে যত বড়ই হন না কেন, মান্যে সব সময়েই উনি আমার চেয়ে ছোট। আত্মীয়তায় উনি যে আমার ছোট বোনের বর।"

তুলনার আপেক্ষিকতা নিয়ে কি আশ্চর্য সত্যোপলব্ধি , কি আশ্চর্য রসবোধ । সৃষ্টিশীল এমনতর ব্যক্তিত্বদের নিয়ে তুলনা করা যে কত অবাস্তব কত ছেলেমানুষী , ওস্তাদজী যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে এই মহা সত্যটাই সেদিন আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন । পুলক এবং গৌরীর মতো গীতিকারদের মধ্যে তুলনার প্রশ্নেও ওস্তাদজীর হেঁয়ালীটাই আমার ভীষণ মনে পড়ে যায় । এদের মধ্যেও বাস্তবিক কোন তুলনা চলে না । গৌরী গৌরীই , উনি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় নন , আবার পুলক পুলকই , গৌরীপ্রসন্ন নয় । নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে দুজনেই গ্রেট রাইটার , মহান গীতিকার । দুজনই আমার খুবই ঘনিষ্ঠজন । দুজনার গানই আমি প্রচুর গেয়েছি । দুজনার গানই আমায় ভীষণ ভাবে ভাবায় এবং দুজনার মহান গীতিকা গুচ্ছ নিয়ে কাজ করতে পারার সুযোগ পেয়ে আমিও বোধ হয় সুর - তাল-লয়ে গেয়ে বাংলার সংগীত জগতে কিছু কিছু চিহ্নিত গান তুলে ধরতে পেরেছি ।

পুলকবাবুর সাথে আমার পরিচয় সেও একটা ঘটনা । হিন্দী গানের জগতে কিছুটা স্থান করে নেয়ার পাশাপাশি গৌরীবাবু, সুধীন বাবু, শ্যামল গুপ্ত , প্রণব রায় এদের লেখা গান গেয়ে বাংলা গানের জগতেও আমি একটু একটু করে এগিয়ে গেছি বেশ কিছুটা পথ , সেরকম একটা সময়ে , সেই আটান্ন বা ঊনষাট সালের কোন একটা সময়ে পুলকবাবুর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ,যিনি চাকরী সূত্রে তখন বম্বেতেই থাকতেন , তার কাছেই প্রথম আমি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনি এবং তারই মধ্যস্থতায় পুলকবাবুর সাথে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত । ওঁর লেখা " আমার না যদি থাকে সুর ..." এবং " জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই " গান দুটো যখন প্রথম আমি রেকর্ড করি , practically তখনও আমরা একজন অন্যজনকে প্রায় চিনি না বল্লেই চলে । যতটুকু যা চিনতাম , সেটা চিঠির মাধ্যমে । এমনকি এই " আমার না যদি থাকে সুর .." এবং " জানি তোমার প্রেমের যোগ্য .." গান দুটোও উনি চিঠিতেই আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন । চাক্ষুষ পরিচয় হয় তারও প্রায় কম করেও বছর দেড়েক পরে । গৌরীবাবুর মতোই প্রথম পুলকবাবুও প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই গীতিকার এবং গায়কের প্রফেশনাল সম্পর্কের সঙ্কীর্ণ গন্ডির বাইরে এসে একেবারে একসাথে বসে ' খিচুড়ি খাওয়া ' ঘরোয়া বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন । খাওয়ার কথা বলতেই পরিচয়ের প্রথম পর্বের সেই ফেলেআসা দিনে ওরই লেখা একটা বিশেষ গানের কথা হঠাৎ আজ মনে পড়ে গেল । - একদিন মেয়েদেরকে নিয়ে আমার স্ত্রী সুলু কোথায় যেনএকটু বাইরে গেছে । ঘরে আমি একা একা আর কী করি ! টুক টুক করে রান্নাতেই হাত লাগিয়ে দিলাম । এমন সময় হঠাৎই পুলক বাবু এসে উপস্থিত । তা আমি তো কিচেনে হাতে হলুদ- মশলাপাতি লাগিয়ে পাক্কা রাধুনির মতো ঘেমে - নেয়ে একাকার হচ্ছিলাম, ওঁর সাথে ঠিকমতো কথাও বলতে পারছিলাম না । উনি আর একা একা বসে বসে কী করেন !

আমার সাথে টুক টাক দু - একটা কথা বলতে বলতেই ডাইনিং টেবিলে পড়ে থাকা একটা কাগজের প্যাকেটের ওপর খস খস করে উনি কি যেন লিখে যাচ্ছিলেন, আমি ততটা মন দেই নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্নার পাট চুকিয়ে আমি যখন ওর পাশে এসে বসলাম, উনি আমার সামনে আস্তে করে ঠোঙ্গাটা এগিয়ে দিলেন । চেয়ে দেখি আমাকে অবাক করে দিয়ে ততক্ষণে ওতে একটা আস্ত গান লেখা হয়ে গেছে, - "আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না, ইস্তাম্বুল গিয়ে, জাপান- কাবুল গিয়ে, শিখেছি সহজ এই রান্না।" এই হচ্ছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। এভাবেই জন্ম হয়েছিল এই গানটার, যেটা পরে "প্রথম কদম ফুল" ছবিতে একটা পিকনিকের সিকোয়েন্সে আমাকে দিয়েই গাওয়ানো হয়েছিল। এতটা ঘনিষ্ঠতার জন্যই হোক বা অন্য যে কোন কারনেই আমার জীবনের অনেক ঘাত প্রতিঘাতের সাথেই পুলকবাবু একসময় বিশেষ ভাবেই জড়িয়ে গিয়েছিলেন। যে কারণেই ওঁর সাথে আমার frequency টা একসময় খুব ভালো মিলতো এবং comparatively ওঁ আমাকে অনেকের চেয়েই বুঝতোও খুব বেশী। একদিন উনি যেমন লিখে দিয়েছিলেন - " আমার না যদি থাকে সুর ....," বা "শোন ও গরবী ..." র মতো উদ্দাম প্রেমের গান, আবার আমার জীবনের মান- অভিমানের পালায় ওঁর কলম দিয়েই তেমনি একদিন বের হয়েছিল, -"তুমি অনেক যত্ন করে আমায় দুঃখ দিতে চেয়েছো.........","একি অপূর্ব প্রেম দিলে বিধাতা আমায় ...." বা " অভিমানে চলে যেওনা"র মতো আমার হৃদয় ছোঁয়া স্পর্শকাতর গান।

আমি বাংলা গান শুরু করেছিলাম গৌরীর লেখা দিয়ে। কিন্তু দু-একবার রেকর্ড করবার পরই দেখলাম যে কলকাতায় গৌরী তখন এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কিছুতেই আমার জন্য ঠিক সময় করে উঠতে পারছিলেন না। বেশ কিছু চিঠি পত্র লিখেও যখন দু-তিন বছরের মধ্যেও কোন গান পাচ্ছিলাম না, তখনই প্র্যাকটিকেলি ঘটনা চক্রে পুলকবাবুর সাথে আমার যোগাযোগটা হয়ে গিয়েছিল। শুধু যোগাযোগই নয়, আরও স্পষ্ট করে বল্লে ওর সাথে আমার জুটি বেঁধে গিয়েছিল। জুটি মানে কি, ১৯৬০ থেকে শুরু করে '৭৪ সাল পর্যন্ত টানা প্রায় বার-তেরো বছর পুলকের গান ছাড়া আর কারো গান আমি practically গাইনিই। এই রকম যখন অবস্থা, যখন বিজ্ঞাপনের ভাষায় আমাদের জুটির জনপ্রিয়তা প্রায় ঈর্ষার পর্যায়ে চলে এসেছে, তখন গৌরীবাবু একদিন এসে আক্ষেপ করে বল্লেন, - "মান্নাদা, আজকালতো আপনি শুধু পুলকের লেখা গানই গাইছেন, তা আমরা কী দোষ করলাম ? আমরা কি এতই খারাপ লিখছি ? তবে কেন আমরা আজকাল সুযোগই পাচ্ছিনা ?"আমি দেখলাম এই সুযোগ। সৃষ্টিশীল মানুষের মধ্যে এই আক্ষেপ, এই যে একটা প্রতিযোগী মনোভাব এটা তো সবসময়, সব দেশেই সৃষ্টিকে বারবার মহত্তর করে তুলেছে। এ সুযোগ হাত ছাড়া করা যাবে না। তৎক্ষনাৎ ঠিক করে ফেল্লাম সে বছর দুজনার গানই একই রেকর্ডে একই সাথে পাশাপাশি গাইবো। গৌরীকে

বল্লাম -"না না, ও সব খারাপ ভালোর কোন ব্যাপার নয়। পুলকই যে আমার জন্য বরাবর গান লিখে দিচ্ছে। তাই ওর গানই গাইছি বছরের পর বছর। আপনি গান লিখে দিন , আপনার গানও নিশ্চয়ই গাইবো।" তা গৌরী আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল গান লিখতে ।এদিকে এমনতর সব কথাবার্ত্তা শুনে টুনে আমার বিগত প্রায় যুগাধিক বছরের বহু জনপ্রিয়তর গানের গীতিকার পুলকবাবু সেবার মনে মনে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। একদিন এসে মুখ ফুটে আমায় বলেই ফেল্লেন -" মান্না দা , গৌরী দার চেয়ে আমি কি খারাপ লিখছি ? তা না হলে টানা বছরের পর বছর ধরে আপনার জন্য এত এত গান লেখার পর এবছর হঠাৎই আমাকে বাদ দিয়ে গৌরীদাকে দিয়ে গান লেখাচ্ছেন কেন ?" আমি ওকেও বোঝালাম যে " এটা কোন খারাপ - ভালোর ব্যাপারই নয়। আপনারা দুজনই আধুনিক বাংলা গানের দুই দিকপাল গীতিকার। আপনাদের মধ্যে ছোট-বড়র কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এই যে আপনাদের মধ্যে একটা হেলদি কম্পিটিশন হবে, এতে করে ultimately আপনাদের দুজনের এবং সর্বপরি বাংলা আধুনিক গানের একটা দারুণ উপকার হবে বলেই আমার একান্ত বিশ্বাস।" এত বছর ধরে পূজোয় মাত্র দুটো করেই তো গান গাওয়ার প্রচলন ছিল কিন্তু সে বছর ঠিক করলাম যে দুটোর পরিবর্ত্তে E.P .disc এ দুজনের দুটো দুটো করে মোট চারটি গান গাইবো। সু-শিল্পের তাগিদে, প্রতিযোগিতার তাগিদেই সেবার গৌরী যদি লিখেছিল -" ওগো বর্ষা তুমি ঝোরো নাকো এমন জোরে ," তবে পুলক লিখেছিল" তুমি একজনই শুধু বন্ধু আমার " এবং পুলক যদি লিখেছিল " আমার ভালোবাসার রাজপ্রসাদে নিশুতি রাত গুমরে কাঁদে " তবে গৌরী সেদিন গানে গানেই তার জবাব দিয়েছিল " যদি কাগজে লেখো নাম কাগজ ছিঁড়ে যাবে।" বহু প্রতিক্ষার পর শ্রোতারাও সেবারই প্রথম সুযোগ পেয়েছিল সমকালীন দুই মহান গীতস্রষ্টাকে আমারই কন্ঠে পাশাপাশি শোনবার। এবং সে বছরের পূজোয় এসব গান শ্রোতাদের ভালোও লেগেছিল খুব। কিন্তু ওদের সাথে এতদিন ধরে কাজ করে করে আমার নিজের বারবারই মনে হয়েছে যে ওদের দুজনের মানসিক গড়নটা, গানের উৎস টা বোধহয় একটু ভিন্ন ,একটু অন্য। গৌরীর লেখা গীতিকার মতোই বাস্তবেও ওর মনের কোণে কোথায় যেন সত্যি সত্যিই একটা বিরহের ফল্গু চিরদিনই নীরবে বয়ে গেছে । সেই প্রথম গান " কতদূরে আর নিয়ে যাবে বল" থেকে শুরু করে "তুমি আর ডেকোনা ," " এই সেই ঘর ," " সবই তো পেলাম তবু ," " কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আর নেই " ইত্যাদি ওঁর প্রায় প্রত্যেকটা গানেই ওঁর মনের সেই স্পর্শকাতরতার ছোঁয়া-ই আমাদের মনকেও বার বারই ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে সদ্য ও যখন দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বম্বেতে চিকিৎসা করাতে এসেছিল , তখন ঐ অসুস্থ অবস্থাতেই মৃত্যুর সাথে শেষ লড়াইয়ের মধ্যেও ক্ষীণ আশার তীব্র আর্তি নিয়েই একদিন আমার কাছে ও লিখে এনেছিল মৃত্যু পথযাত্রীর সেই

হৃদয়দ্রাবী গান-" আমি কী আর ভালো হব না ডঃ রায় ?? আমাকে আপনি বাঁচিয়ে দিন , পৃথিবীতে থাকতে চাই আর কটা দিন , ডঃ রায়। " - ওর মতো বন্ধুর হৃদয়ের একেবারে অন্ত্যঃস্থল থেকে উঠে আসা ঐ রকম কান্না মেশানো শেষ গান নিমেষেই আমাকেও সেদিন ভীষণ ভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল। ওর খুব ইচ্ছে ছিল আমার গাওয়া তীব্র মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে ও ওর এই তীব্র বাঁচার আশার শেষ গান টা যেন ওর শেষ যাত্রায় শেষ বারের মতো ওকে একবার বাজিয়ে শোনানো হয়। - আজ গৌরী আমাদের সবাইকে ছেড়ে দূরে - অনেক দূরে চলে গেছে। শুধু রয়ে গেছে ওর লেখা সেই সব অনুভবী গান - "বাতাস আসবে বলে জানালাটা খোলা।" - জীবনের সায়াহ্ন বেলায় আজ যখনই ওর লেখা কোন গান গাইতে যাই , মনে মনে ভীষণ 'মিস' করি ওকে।

জীবনের সুখ -দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে আমার মনেও হয়তো অনেক সময়ই অনেক রকম অনুভূতি উঁকি দিয়ে গেছে। হয়তো কলমে রূপ দিতে পারলে আমার সে সব আনন্দ - বেদনার সূক্ষ্ম অনুভূতিও কালোত্তীর্ণ লোকপ্রিয় গীতিকা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারতো।কিন্তু বাস্তবে সে গান কোন দিনই আমার আর লেখা হয়নি। বরং শ্যামল গুপ্ত , প্রণব রায় , মিল্টু ঘোষ ,দীপঙ্কর ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ , বটকৃষ্ণ দে , মুক্তি রায় চৌধুরী , অজয় দাস, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় , জহর মজুমদার প্রমুখ গীতিকারদের গীত -দর্পণের মধ্যেই যেন বার বার খুঁজে পেতে চেয়েছি আমার মনেরই সেই সব না লেখা অনুভূতি গুলোকে। এবং তার সাথেই নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছি অন্তরে এতটুকুও ফাঁক না রেখে। গীতিকারদের গীতিকার সাথে আমার হৃদয়ের সেই নির্ভেজাল একাত্মতা বোধ থেকেই হৃদয়ে বার বার গুন-গুনিয়ে গেছে সুর , আমিও হয়ে গেছি আমার অধিকাংশ শারদঅর্ঘ্যের সুপ্রতিষ্ঠিত সুরকার। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার যে বম্বেতে আমার সংগীত যাত্রার সূত্রপাত যদিও মূলতঃ সংগীতকার হিসেবেই একদিন শুরু হয়েছিল , কিন্তু চলচ্চিত্রের নিয়মিত সংগীতকার হতে গেলে পুরো ব্যাপারটার সাথে যে রকম ভীষণ involvement থাকা দরকার , তাতে আমার গায়ক সত্ত্বার অপমৃত্যুর ভয়েই practically একদিন বহু দুঃখ নিয়েও সংগীতকার হওয়া লালিত স্বপ্নটাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। জীবনের সেই অপূর্ণ সাধ , গুমরে গুমরে ওঠা সেই মনোবাসনাই যেন সেদিন শারদ অর্ঘের সুরকরণের মধ্য দিয়ে খুঁজে পেয়েছিল তার উন্মুক্ত আকাশ। সুরকার হিসেবে আমি কতটা সার্থক হতে পেরেছি , সে সব সুর কতটা জনপ্রিয় হয়েছে সে সব মূল্যায়ন করবার উপযুক্ত লোক আমি নই . এবং এমনতর ডেলিকেট প্রসঙ্গ নিয়ে আত্ম সমালোচনা করার মতো বুকের পাটাও আমার নেই। কিন্তু এত কিছু পর নির্দ্বিধায় এইটুকু অন্তত বলবোই যে গীতিকার দের লেখা - না লেখা সমস্ত আনন্দ - দুঃখের আপন অন্তর-মাধুরীর সাথে মিশিয়ে,হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উঠে আসা সুরের ঝর্ণাধারায় যে ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি

এবং সেসব sweetest songs শুনে আমার প্রেয়সী তথা জীবন সঙ্গিনী সুলোচনা সে সব গানকে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্ব ভেবে যে ভাবে কখনো কখনো ভীষণ মুষড়ে পড়েছে , আঘাত পেয়েছে ,আমার প্রচেষ্টার মূল্যায়নের মানদন্ড হিসেবে এটুকুই আমার কাছে সেদিন প্রকৃত পাওয়া বলে মনে হয়েছিল। কাগজের ফুল দিয়ে ভ্রমরকেও ভ্রমসংকুল করতে পেরে সত্যিই মনে মনে সেদিন আমি খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম।

' ডিম আগে না মুরগী আগে " বিতর্কের মতোই সুর আগে না গীত আগের প্রশ্ন নিয়েও সংগীত মহলে নানান ধারণা নানান বিতর্ক প্রচলিত আছে। কেউ বলেন আগে কথা তারপর সুর আসা উচিৎ , আবার কেউ বলে আগে সুর, তারপর কথা। কিন্তু আমার জীবনের এতদিনকার অভিজ্ঞতায় আমি যতটুকু যা উপলব্ধি করেছি, তাতে এইটুকুই আমার মনে হয়েছে যে গানের বাণীর ভাবকে অর্থবহ করে তুলতেই যদি সুরের প্রয়োজন ,আমি যতটুকু যা উপলব্ধি করেছি, তাতে এইটুকুই আমার মনে হয়েছে যে গানের বাণীর ভাবকে অর্থবহ করে তুলতেই যদি সুরের প্রয়োজন , তবে বাণীর পরই সুরারোপ হওয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায়ই এটাও দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত মহান সংগীত স্রষ্টার সৃষ্টিতেই এর উল্টো পদ্ধতিটাও পাশাপাশি সমান অর্থবহ ,সমানভাবেই যুক্তিযুক্ত এবং সমান ভাবেই প্রচলিত। যেমন নজরুলের একটি বিখ্যাত গান -"শূণ্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়," এটাতো practically রবীন্দ্রনাথের একটা গান "অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায় " গানের সুরের ওপর ভিত্তি করেই কথা বসিয়ে যাওয়া। আমার যে সমস্ত গান শ্রোতাদেরকে আকৃষ্ট করেছে, সমালোচকদেরও ভালো লেগেছে , যেমন 'আমি নিরালায় বসে বেঁধেছি ," "আজ আবার সেই পথেই দেখা", " তীর ভাঙ্গা ঢেউ " ইত্যাদি গানের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই প্রথমে এসেছে 'কথা' এবং কথাকে অর্থবহ করে তুলতেই পিছে পিছে এসেছে সুর। সুর করার ক্ষেত্রে আমার বারবারই মনে হয়েছে যে গানের কথাটাকে , গানের অন্তর্নিহিত ভাবটাকে যদি হৃদয়ঙ্গম না করা যায় , তবে শুধু রাগ-রাগিণীর পান্ডিত্য দিয়ে কোনদিনই ভালো সুর কথা সম্ভব নয়। তেমনটা করতে গেলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা হয়ে যাবে নথকে পায়ে এবং পায়েলকে বাজুতে পরিয়ে দেয়ারই সামিল। যে কারণেই গীতিকার নয় , গীতিকা-র ব্যাপারেই আমি বরাবরই too much choosy. কি হিন্দী, কি বাংলা , কি মারাঠী ভালো কথা না পেলে আমার মধ্যে ভালো সুর যেন ধরাই দিতে চায়না। Professional singer হয়েও আমার গাইতেই ইচ্ছে করে না সেই সব গান। এই গেল সুরকরার একটা দিক। আবার অন্যদিকে " ললিতা গো ওকে আজ চলে যেতে বলনা ," "সুন্দরী গো দোহাই দোহাই ," " কে গো নাগরী একা যাও বাজিয়ে পায়ের নুপুর " এরকম অনেক গানই

আছে , যেখানে প্রথমে এসেছে সুর এবং পরে সুরের আবেদন মতো এসেছে'কথা ' । যেমন ধরা যাক ললিতা গো গানটারই কথা। বহু দিন আগে সেই ছেলেবেলার বাবু কাকার কাছে একটা ঠুংরী শিখেছিলাম '' শ্যাম ঘুংঘটকেপট খোল ''। খুবই বিখ্যাত ঠুংরী। তা , একদিন কলকাতার বাড়ীতে বসে এমনিই তানপুরাটা নিয়ে একা একা সেই ঠুংরীর মুখটা একটু ভাজছিলাম।তখন ঘটনাচক্রেই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে এলেন এবং গানটা শুনে ফেল্লেন। শুনে বল্লেন ,-'' মান্নাদা , গানের সুরটার মধ্যে কোথায় কি যেন একটা অন্যরকম রোমান্টিক আবেদন আছে। এই সুর বাঙ্গালীর কোমল হৃদয়কে 'টাচ' করবেই করবে। আপনি আর একবার গানের মুখটা আমায় শোনান।'' ওর কথা মতো আমি আবার গানটা শুরু করলাম -''শ্যাম ঘুংঘটকে পট খোল''। গানটা শেষ হতেই আমার সামনে একটুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বল্লেন , '' দেখুন কেমন হয়েছে গানটা।'' গানটা দেখে আমি তো একেবারে 'থ'। স্পষ্ট গোটা গাট। অক্ষরে লেখা - '' ললিতা গো ওকে আজ চলে যেত বলনা ''। -সুরের যথার্থ ভাববাহী গানের ওরকম অর্থবহ কথা দেখে আমার এত ভালো লেগে গেল যে ঠুংরীর ঐ হিন্দী শব্দগুলো বদলে তৎক্ষনাৎ গেয়ে উঠলাম -''ললিতা গো ওকে আজ চলে যেতে বলনা ....''। আবার প্রেম ধাওয়ান এর কথা ও ডি. দিলীপের সুরে 'প্রাইভেট সেক্রেটারী ' ছবিতে আমারই গাওয়া একটি হিন্দীগান-'' যা রে বেঈমান তুঝে জানলিয়া জানলিয়া ''গানের সুরকে নিয়েই এই সেদিনই লেখা হয়ে গিয়েছিল- '' কে গো নাগরী একা যাও বাজিয়ে পয়ের নুপুর ......'' কই , এসব গান ভালো হয়নি বা শ্রোতাদের ভালো লাগেনি , তেমন তো হয়নি। আসলে গানের ক্ষেত্রে সুর আগে এলো না , কথা আগে এলো, এসবগুলো তেমন কোন major factor ই নয়। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কথার সঙ্গে সুরের যথার্থ্য মেলবন্ধন হওয়া।''দরদী গো কী চেয়েছি '' র মতো soft sentiment এর গান যদি ''তুমি চিঠি লিখে ভুলে গেলে '' র মতো গানের সুরে গাওয়ার চেষ্টা করা হয় , বা '' জীবনে কী পাবোনা, ভুলেছি সে ভাবনা '' র মতো গান যদি ''আমার এক দিকে শুধু তুমি ''র গানের সুরে গাইবার চেষ্টা করা হয় , তবে সেই সব গান নির্দ্বিধায় সুকুমার রায়ের ''হাঁসজারু '' মতো কিম্ভুত দর্শন হতে বাধ্য এবং গানের জগতে হাঁসের সাথে সজারুকে মিশিয়ে এরকম '' হাসজারু'' মার্কা গানই বাজারে আজকাল ছেয়ে গেছে। কিন্তু বাজার ছেয়ে ফেলার নামে কোন পণ্যকে একেবারে ''বাজারে '' করে তোলাটাও যে খুবই একটা সুরুচিদায়ক নয়, এই অপ্রিয় সত্যটাও বোধহয় আমরা এত সহজেই অস্বীকারও করতে পারিনা।

'গান গাওয়া ' এবং 'সুর করা ' সংগীতের এই দুই ক্রিয়াত্মকতাতেই আমার সমান আনন্দ,যেকারণেই গায়ক সত্বাটাকে বাঁচানোর তাগিদে সুরকার জীবনটাকে একদিন দূরে ঠেলে দিতে চাইলেও প্রবল

সম্ভাবনাময় না দেখা সেই জীবনটার জন্য সবসময়ই আমার মধ্যে একটা 'আত্মিক টান আমি অনুভব করেছি। এবং সেই টানেই নিজের গাওয়া অধিকাংশ শারদ-অর্ঘ্য বা ' Soulfully yours ' অনেক গানেরই সুর যেমন আমি করেছি , তেমনি শুধু আমার নিজের গানেরই নয় , অন্যদের গানেও , এমনকি 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন ,' 'কত ভালোবাসা' ইত্যাদি কিছু কিছু বাংলা ছায়া ছবিতেও শেষপর্যন্ত আমি সুরকরার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। কলকাতায় থাকাকালীন সেই চল্লিশের দশকের শুরুতে আমি যখন গান গাওয়ার জগতে প্রথম পদক্ষেপটি ও দিইনি, তারও বেশ কিছু আগেই আমি সুর করেছিলাম "ওই বালুকা বেলায় অলস খেলায় যায় বেলা " গানটা , যেটা আমি নিজে নয় বরং গেয়েছিল সেকালের জনপ্রিয় গায়িকা সুপ্রীতি ঘোষ। এরপর বম্বেতে মোটামুটি কিছু একটা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর আমি যখন আবার নতুন করে কলকাতাতেও একটু একটু করে গান বাজনার জগতে ফিরে আসি , তখন সেই ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে লতাজী, আশাজী , সুমন কল্যানপুর এদেরকে দিয়েও একসময় বাংলায় বেশ কিছু গান করিয়ে ছিলাম। লতাজীর গাওয়া 'দেখোনা আমায় ওগো আয়না " বা আশাজীর গাওয়া 'আমি খাতার পাতায় চেয়েছিলাম " এসব গানে সুর করে আমি নিজে যেমন সেদিন খুবই তৃপ্তি পেয়েছিলাম , তেমনি ওরাও গানগুলো সত্যিই খুবই ভালো গেয়েছিল। কলকাতার শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র হৈমন্তী শুক্লা ছাড়া আর কেউই বোধহয় আমার সুর করার wave length টা এত ভালোভাবে বুঝতে পারেনি বা আমার সুরে কথার এত ভালো expression দিতে পারেনি। হৈমন্তীকে দিয়ে গান করানো সেও আসলে একটা মজার ঘটনা।

হৈমন্তী তখন গানের লাইনে একেবারেই নতুন। এখানে ওখানে ফাংশনে টাংশনে গেয়ে লতাকন্ঠী হিসেবে সবে কলকাতায় তখন ওর একটা image গড়ে উঠেছে। তা একবার হ'ল কি হাওড়াতে পুলকবাবুর একটা প্রোগ্রামে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই সেদিন আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি যখন পৌঁছলাম দেখি একটি মেয়ে তখন গান গাইছে। গলাটা শুনে খুবই ভালো লাগলো। পুলককে ডেকে জানলাম মেয়েটির নাম হৈমন্তী। তো গান শেষ হতে ওকে ডেকে বল্লাম যে " তোমার গলাটাতো ভারী সুন্দর। ভালো করে practise করো। আর সময় হলে একদিন বাড়ীতে এসো , তোমার আরো গান শুনবো।" এর বেশ কিছুদিন পর একদিন দুপুরের দিকে আমি , পুলক, রাধুবাবু সবাই মিলে সেবারের পূজো সংখ্যার গান নিয়ে আলাপ আলোচনা করছি , গান লেখা হচ্ছে , রিহার্সাল চলছে,এমন সময় হৈমন্তী এসে উপস্থিত। তা, ওকে বসিয়ে রেখেই এবং ওর সাথে দু- একটা কথা বলা বা দু- একটা গান শোনার ফাঁকে ফাঁকেই আমাদের রিহার্সালটাও সিরিয়াসলিই করে যাচ্ছিলাম। আর ও চুপচাপ বসে বসে সে সব শুনছিল। তা কি হল কে জানে, তখন, যে গানটার সুর করছিলাম হৈমন্তীর বোধহয় সুরটা খুবই ভালো লেগে

গিয়েছিল, রিহার্সালের মধ্যেই বল্লে - "মান্না দা, আমার বহুদিনের ইচ্ছা আপনার সুরে গান গাইবার। আপনি যদি আপনার সুরে আমাকে একবার গাইবার সুযোগ দেন......।" ওর সেই কথার মধ্যে কী ভীষণ সহজতা ছিল জানিনা, কিন্তু পুলকবাবু ও রাধুবাবু দুজনেই কেন জানিনা খুব ধরে বসলো রিহার্সাল চলতে থাকা সদ্য লেখা আমার সেবছরের পূজো সংখ্যার জন্য নির্বাচিত সেই গান গুলোই ওর মতো একেবারে নবাগতা একজন শিল্পীকে দিয়ে গাওয়াতে। যোগাযোগটা এমন সুন্দরভাবে হয়ে গিয়েছিল, কথাবার্ত্তা গুলো এত আন্তরিকভাবে এগিয়ে গেল যে আমার জন্য নির্বাচিত, আমারই সুরারোপিত তথা রিহার্সালকৃত সেবারের পূজোর গান শেষপর্যন্ত বের হল ঐ হৈমন্তরই কন্ঠে রেকর্ড হয়ে এবং সে বছর সে গান hit ও হয়েছিল খুব। - "চেয়ে চেয়ে দেখলাম, আমার বলার কিছু ছিলনা ...."। এভাবেই তৈরী হয়ে ছিল ওর জীবনের আরও একটি বিখ্যাত গান - "কেন নয়নে আবীর ছড়ালে"। বোধহয় এটা আটাত্তর কি ঊনআশি সালের কথা। নবাগতা শিল্পীদের মধ্যে কবিতা কৃষ্ণমূর্ত্তিকে দিয়েও একবার পূজোয় গাইয়ে ছিলাম, - " এই পলাশের দেশে একা একা এসে তোমায় কেবলি মনে পড়েছে।" কবিতা তো practically একেবারে আমার মেয়েরই মতো। আমার মেয়ের বান্ধবী ছিল ও। আমাদের বাড়ীতে ও আসা যাওয়া করছে সেও আজ প্রায় কুড়ি বছরের কথা। সংগীতের ক্ষেত্রেও কবিতা প্রায় আমার নিজের হাতেই তো গড়া। ওর গলার প্রকৃতির সাথে মেলে এমনতর গানে নিজের প্রতিভার যথেষ্ট প্রমাণ রাখতে পারলেও এই যে - "এই পলাশের দেশে, - একাএকা এসে, - তোমায় কেবলি মনে পড়ছে।" মনের এই যে একটা কোমল অনুভূতি, মেয়েটা এর মধ্যে ঠিক যেন ঢুকতেই পারলো না। এত ভালো 'কথা' এত পরিশ্রম করে তৈরী করা সুর কবিতার এত প্রচেষ্টা, এতকিছুর পরও সেকারণেই গানটা যেন কিছুতেই সেদিন লোকের নজরই পড়লো না। এভাবেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমার সুরকরা অন্য একটি গান -" আমি ভুল করেছি গো"। যেটা গেয়েছিল উৎপলা সেন। আমার মেয়ে সুমিতা এবং ভাইপো সুদেবকে দিয়েও আলাদা আলাদা ভাবে কিছু গান করিয়েছি।

গান বাজনার ক্ষেত্রে গীতিকার, সুরকার বা শিল্পীর জীবনের এই উপলব্ধি বা বয়সের ব্যাপারটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খুব একটা vital factor হয়ে দাঁড়ায়। এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে গাওয়া আমার নিজের গাওয়া অনেক গান নিয়েও আজকাল আমার নিজেরও সেই একই কথাই বারবার মনে হয়। "দরদী গো কী চেয়েছি ......" বা " ও গো তোমার শেষ বিচারের আশায় আশায় বসে আছি ......" গানগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও গানগুলো যখন রেকর্ড করি, তখন কথাগুলোর এত ভেতরে বোধহয় সেদিন আমি ঢুকতেই পারিনি। আজ হয়তো সেদিনের মতো যৌবনের স্বপ্নমাখানো রোমান্টিক কন্ঠ আমার নেই, হয়তো বয়সের ভারে

কন্ঠ কিছুটা ক্লান্ত আজ , কিন্তু জীবনের সায়াহ্ন বেলায় আজ " ওগো তোমার শেষ বিচারের আশায় ...." বা " কি পাইনি তার হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজী " গান গুলো যত গভীরভাবে আজ বুঝতে পারি, যত অনুভব, নিরবে আজ আমি গাইতে পারি , পঞ্চাশ বছর আগে বয়সের অপরিপক্কতায় অবশ্যই সেই realization টা ছিলনা। গান-বাজনার ক্ষেত্রে বয়স, অভিজ্ঞতা এ সব গুলো যে কী ভীষণ একটা ব্যাপার , এই সত্যটা আরও স্পষ্টতর করে বুঝেছিলাম "তুই কি আমার পুতুল পুতুল সেই ছোট্ট মেয়েই" গানটা তৈরী হওয়ার সময়। মিল্টু ঘোষ গানটা লিখে দেয়ার পর, আমি খোকাকে ওটা দিয়েছিলাম সুর করার জন্য। তা, ছেলেটা গানটা যেন ঠিক বুঝতেই পারলোনা। কয়েকদিন চেষ্টা চরিত্র করার পর একদিন এসে আমায় বল্লে -"কাকু , গানের কথা গুলো যেন একটু ক্যামন , ঠিক যেন ভালো লাগছে না।" আসলে এত বছরের পর বছর হৃদয়ের উজাড় করা স্নেহ মায়ায় মানুষ করা সেই ছোট্ট মেয়েটির বিয়ে হয়ে চলে যাবার ব্যথায় ব্যথিত কোন পিতৃ হৃদয়ের এই সূক্ষ্ম অনুভূতিটা practically খোকা তখন বুঝতেই পায়নি আর বুঝবেই বা কি করে ! ওর তো নিজেরই তখনো বিয়েই হয়নি। ও কি করে বুঝবে এতবছরের নানান টুকরো স্মৃতিরা এসে কোন ব্যথিত পিতৃহৃদয়ের সেই বিশেষ মূহূর্তে কী এলোপাথাড়ী ঝড় তুলে যায় ! আমি বল্লাম ,-"ঠিক আছে , তুমি গানটা আমাকে দিয়ে দাও।"তো , খোকা গানটা আমায় দিয়ে চলে গেল। এটা যে সময়কার কথা বলছি ত ন ঘটনাচক্রে এর মাস খানেক পরেই আমার মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। তারই সব কেনাকাটা,যোগাড়যন্ত্রের এবংবিধ প্রস্তুতি চলছিল তখন। Definitely কন্যাবিদায়ের আসন্ন মুহূর্তের দিকে চলতে চলতে আমার মনটাও যখন practically একটু একটু করে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল, সেই রকম একটা খুবই উপযুক্ত সময়েই গানটা আমার হাতে এসে পোঁছল। সেই একেবারে আঙ্গিনায় হামাগুড়ি দেয়ার সময় থেকে শুরু করে বিয়ের আসরে হাতে মেহেন্দি , সিঁথিতে সিঁদুর লাগানো টুকটুকে বউটি পর্যন্ত হয়ে ওঠা এতদিনের এত ঘনিষ্ঠ সব মূহুর্তের সূক্ষ্ম ছবিগুলো গানের মধ্য দিয়ে মিল্টুবাবু এঁকে ছিলেনও খুবই সুন্দর। আমি খুবই choked হয়ে গিয়েছিলাম গানের কথা গুলো দেখে। যাই হোক , গানটা শেষপর্যন্ত একদিন তৈরী হল। কিন্তু আবার অসুবিধে দেখা দিল গানটার music arrange করবার সময়। গানের ঐ শেষ অন্তরাটা যেখানে আছে - " যা যা ছিল সবই আছে ,শুধু রইবো আমি একা।", সেখানটায় সুরের ঐ যে একটা break আছে , ঐ break টা নিয়েই গানের music arranger শুরুতে খুবই আপত্তি করতে লাগলেন-"..... যে, মান্নাদা ,এই break টা কেমন যেন একটু বেখাপ্পা লাগছে।" তা, আমি ওকে বুঝিয়ে বল্লাম যে ' দেখুন যতবারই আমি গানটা গাইছি , এই খানটাতে এসেই গলাটা কেমন যেন বারবারই choked হয়ে যাচ্ছে , automatically ই এ জায়গাটাতে একটা

break এসে পড়ছে। তাই আমার মনে হয়, ঐখানটাতে এই break টা থাকা বোধহয় খুবই দরকার।" অনিচ্ছা সত্বেও শুধু আমার প্রবল জেদেই break টা ও সেদিন মেনে নিয়েছিল এবং সেভাবেই গানটা সে বছরের পূজোয় রেকর্ড করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ break টা শেষ পর্যন্ত ও music arranger এর মোটেও ভালো লাগেনি। কিন্তু এর বেশ কিছুদিন পর একদিন যখন ঐ music arranger এর নিজের মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেল, অনেক স্বপ্ন মাখানো এতদিনকার একটা হিস্যা আলাদা হয়ে যাবার ব্যথায় ওর নিজের মধ্যেও যখন একটা হাহাকার জেগে উঠলো, পিতৃ হৃদয়ের সেই ব্যথাটা ও নিজে যখন practically সেদিন অনুভব করলো, তখন ও নিজে এসে একদিন আমার কাছে ঐ break টার গুরুত্বটা স্বীকার করেছিল।

কোন একটা গানকে সত্যি সত্যিই সে রকম একটা ভালোলাগার পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সময়ের সাথে তালরেখে যত যা কিছু পরীক্ষা - নিরীক্ষাই করা হোক না কেন, শেষপর্যন্ত গান-বাজনা ব্যাপারটা মানুষের হৃদয়ের গহন গভীরে নিঃশব্দে বয়ে চলা সূক্ষ্মানুভূতি - ফল্গুরই তো আবেগবাহী শব্দময় প্রকাশ। সেক্ষেত্রে আমারই গাওয়া -"হৃদয়ের গান শিখে তো গায়গো সবাই, কজন আর হৃদয় দিয়ে গাইতে জানে....." র খেই ধরেই বলবো যে, গান-বাজনার ক্ষেত্রে গানের কথা, সুর, গায়কী এমনকি গানের সহযোগী music গুলো পর্যন্ত হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদেই আসা উচিৎ, এখনকার অধিকাংশ গানের মতো শুধুই যন্ত্রতে চাপিয়ে দেয়ার প্রবৃত্তির তাগিদে নয়। শুধু গান-বাজনার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বত্রই যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যেমন অপরিসীম, তেমনই যন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখাটাও একান্ত ভাবেই জরুরী। আর সেটা না হলেই যন্ত্রঘটিত সমূহ সর্বনাশ। আমার মনে আছে, রাজকাপুরের "আওয়ারা" ছবিতে শঙ্কর - জয়কিষান মুকেশজীকে দিয়ে একটা গান করিয়ে ছিলেন - "আওয়ারা হু ...।" মুকেশ তো গানটা খুবই ভালো গেয়েছিলেনই, কিন্তু তারচেয়েও শোনবার মতো ব্যাপার ছিল বোধহয় জয়কিষানের ঐ music। গানটার সাথে মিউজিকটা এত ওতপ্রোত ভাবে মিশে গিয়েছিল যে লোকেরা রাস্তাঘাটে এখানে ওখানে যখনি আপনমনে গানটা গাইত, গানের সাথে সাথে ঐ- "আওয়ারা হু, পঅ, পপপ" মিউজিকটা পর্যন্ত হুবহু গাইতে থাকতো। মানে গানটা হচ্ছে আর ঐ "পঅ, পপপ" টা বাজছে না এটা যেন শ্রোতারা ভাবতেই পারতোনা। গানটাও যখন তৈরী হচ্ছিল, তখন ঐ "পঅ -, পপপ" টা শুনে শুনে আমার নিজের কেমন যেন একটা অস্বস্তি মতো হতো। ভাবতাম যে গানটা এত সুন্দর অথচ ঘুরে ফিরে, "আওয়ারা হুঁ" র পরেই কীর্ত্তনের ধূয়োর মতো এটা কি একটা odd "পঅ, পপপ"! তো, একদিন জয়কিষানকে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেসই করে ফেল্লাম -"আরে ভাই, গানেমে ইয়ে "পঅ, পপপ" কিঁউ লগা রখ্যা হ্যায়?" তো, ও বল্লে, -"ক্যায়া হ্যায় মান্না সাহাব, যব যব ইয়ে

শঙ্কর ভাই গাতে থে " আওয়ারা হুঁ, তো ম্যায় ব্যঁয়ঠে ব্যঁয়ঠে গাতাথা 'পঅ,পপপ।" এ্যায়সে হি ইয়ে গানে কে সাথ জুরগয়া, ইয়ে জবরদস্তি লগায়া নহি গয়া।" এবং এই স্বতঃস্ফূর্ত music এর আবেদন যে শ্রোতাদেরকে কিভাবে আকৃষ্ট করেছিল, সে তো যথার্থই এক ইতিহাস।

আধুনিক গানের ক্ষেত্রে এই স্বতঃস্ফূর্ততা, এই স্বাধীনতা ব্যাপারটা খুবই দরকারী। এবং এ ব্যাপারে আমি খুবই লাকি যে আমার এত বছরের সংগীত জীবনে দুই-একজন একেবারেই খুবই খুঁত খুঁতে, নাকউঁচু সংগীতকার ছাড়া বাকী প্রায় সবার কাছ থেকেই কোন গানকে সুন্দর করার এই স্বাধীনতা আমি সব সময়ই পেয়েছি। আমার মনে আছে শচীনদা যখন " পুছোনা ক্যায়সে ম্যায়নে রৈন বিতাই " গানটা বানিয়ে আমাকে গাইতে বল্লেন, তা রিহার্সাল করতে বসে আমি হয়তো বল্লাম যে - "শচীন দা, এ জায়গাটায় music টা যেন একটু ক্যামন লাগছে .....।" ব্যস সাথে সাথে বলে দিলেন -"এই, মানা কইতাসে এই জায়গায় music টা ভাল লাগতাসে না, এই জায়গাটায় music টা এই ভাবে বাজা।" গাইতে গাইতে হয়তো বল্লাম, "দাদা, -'উত্ জ্বলে দীপক, ইত মন মেরা ...' এ জায়গাটায় একটা ছোট বিস্তার মতো করলে বোধহয় ভালো লাগবে। ব্যস সাথে সাথেই লেগে গেল রেকর্ডে গাওয়া ঐ বিস্তার টাও। বিস্তারের কথাতেই মনে পড়ে গেল বাংলা আধুনিক গানেও ঐ ধরণের বিস্তারের মতো কিছু কিছু ব্যাপারকে সংযোজনের কথা। ঠুংরী-দাদরায় সেই যে - " সঁইয়া বোলে। সঁই-ই-য়া বোলে। সঁইয়া বো -ও-লো-, বোলো সঁইয়া ,বো ও ও ও লো -" ইত্যাদি - বোল-বিস্তারের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন সুরের মায়াজালি বুনে বুনে একই কথাকে বিভিন্ন ভাবে যেভাবে তুলে ধরা হয়, কিছু কিছু আধুনিক গান তৈরী করার সময়ও লঘু শাস্ত্রীয় সংগীতের এই বোল বিস্তারের মতো কিছু একটা ব্যাপারও গাইতে গাইতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই বারবার আমার মধ্যে কেন জানিনা উঁকি দিয়ে গেছে। আমার গাওয়া " কথা দাও আবার আসবে " গানে এই বিস্তারকে আধুনিক গানের উপযোগী করেই আমি গেয়েছিলাম - "- কথাদা. . . .আ . . . ও. ও.ও আবা (আ) র আ (আ) সবে কথা দা (আ) ও. . . .আবা (আ) র আসবে, ক্ অ(আ) থা দা (আ আ) আবা (আ) র আসবে,"। আবার অন্যত্র অন্য একটি " যদি উপহার দিয়ে ফেলো একটাও ফুল, একটাও ফুল যদি উপহার দিয়ে ফেলো . . . ." এসব গুলোও খুব সচেতনভাবেই আমি তখন করেছিলাম এবং নতুন ব্যাপার হলেও শ্রোতাদেরকে এই সুরের আবেদন খুব গভীর ভাবেই সেদিন ছুঁতে পেরে ছিল।

শ্রোতে গা না ভাসিয়ে আমাদের নিজস্ব সম্পদকে কাজে লাগিয়েই কি করে নতুন কিছু করা যায়, এই ভাবনাটা সব সময়ই আমাকে ভাবিয়েছে। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে এখন থেকে পঁচাত্তর বছর আগে যে রকম একটা শ্লথ পরিবেশে আমরা জন্মেছিলাম,দুটো বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতালাভ,দেশভাগ,

ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গগনচুম্বী সাফল্য এসব কিছু মিলে মিশে সেই 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' এর জীবনটাই আজ পিছে সরে গেছে বহু দূর। জীবনের সর্বত্রই মানুষ আজকে অনেক বেশী practical, অনেক বেশী fast। এমন কি ঠাকুমার রূপকথা আর মায়ের হাতের পিঠে - পুলি খেয়ে বড় হওয়া বাঙ্গালীও আজ যুগের সাথে পাল্লা দিয়ে 'টু মিনিটস্ নুডলস' এর মতো ফাস্ট ফুড এর পেছনেই ধাবমান। সে ক্ষেত্রে ঝি-ক, ঝিক, ঝি -ক. ঝিক শব্দ তুলে একটু একটু করে গতি বাড়াতে থাকা কোন বাষ্প-চালিত শকটের জানালায় ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকা কোন প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে সজল নয়নে গীত " আবার হবে তো দেখা এ দেখাই শেষ দেখা নয় তো....." বা "তুমি আর ডেকোনা, পিছু ডেকোনা, আমি চলে যাই, শুধু বলে যাই, তোমার হৃদয়ে মোর স্মৃতি রেখোনা ......"ইত্যাদি গান যদি আজকের এই এক লহমায় একশ কিলোমিটার গতিবেগে পৌঁছে যাওয়া মেট্রোরেলের জানালায় উদাস দৃষ্টি নিবদ্ধ কোন বিরহী প্রেমিকের আদৌ একেবারেই ভালো না লাগে। And rather if he feels let down and, সেটা আমাকে একেবারেই অবাক করে না। কারণ রুচির পরিবর্ত্তনটা শুধু এ যুগেই নয়, আমাদের ক্ষেত্রেও আমাদের আগের যুগের অনেক বিখ্যাত গানও আমাদের কানে তখন তেমন শ্রুতি মধুর লাগেনি। এটা সব দেশে সব জমানাতেই হয়েছে এবং হবেও। রুচির এই পরিবর্ত্তনের সাথে যদি কেউ সেভাবে তাল মেলাতে না পারে, তবে অবিলম্বেই সে ট্র্যাকের বাইরে ছিটকে যেতে বাধ্য। কলকাতার ও বম্বের অনেক প্রতিভাবান তথা প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন সুকন্ঠ শিল্পীর হঠাৎ মাঝপথে হারিয়ে যাওয়ার বিশ্লেষণ করলেও এই যুগের সাথে তাল মেলাতে না পারার সত্যটাই প্রকট হয়ে ওঠে। এই টিঁকে থাকার ব্যাপারে আমার নিজের সম্বন্ধে ও এটুকুই শুধু বলবো যে, এই নব্বইয়ের দশকেও আমি যদি শুধু " তী .....র ভাঙ্গা ঢেউ উ.....উ আর, নীর ভাঙ্গা ঝ - (অ)ড় ...." এর মানসিকতায় আটকে থাকতাম, তবে অন্য অনেকের মতোই বহুদিন আগেই আধুনিক গানের ট্র্যাক থেকে বহুদূরে ছিটকে চলে যেতাম।

বছরের পর বছর সংগীতকে নিয়ে চলতে চলতে এমন একটা যুগে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি, যেখানে প্রথাবাহী সেই দাদরা, কাহারবা করে young generation কেমন যেন 'বোর' হয়ে গেছে। আর এই boredom থেকে মুক্তি পেতেই তারা এখন ওরই মধ্যে নতুন নতুন সব ছন্দ খুঁজছে, নতুন ছন্দের কাঠামোয় নতুন আঙিনায় নতুন নতুন notes খুঁজছে। Latin American music থেকে শুরু করে পৃথিবীর সমস্ত সাংগীতিক ধারা থেকেই মানুষ এখন এই সব নতুন নতুন beats, notes লাগানোর এই সব নতুন নতুন টেকনিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের প্রথাবাহী কাহারবার সেই ১২৩৪/৫৬৭৮ ছন্দটাকেও মানুষ এখন ১২/ ১২৩৪/১২, ১২/১২৩৪/১২ এর নতুন ছন্দের মধ্যে খুঁজে পাবার

চেষ্টা করছে। মানুষের মনে নতুন beats নিয়ে এই যে একটা প্রচন্ড খোঁজ, এই খোঁজকে মাথায় রেখেই একদিন আমি গেয়েছিলাম ''কফি হাউসের সেই আড্ডাটা '' বা 'আমার ছোট বোন'' এর মতো একটু অন্য beatsএর গান। এবং young generation এর ছেলে -মেয়েদেরও সেগান তখন খুবই ভালো লেগেছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এই সেদিন তৈরী করেছিলাম '' কেন ফিরে যায় বেদনায় অভিমানিনী গানটি , এখন থেকে দশ-পনেরো বছর আগে হলেও এই গানটা নির্দ্বিধায় ''রাগপ্রধান '' গান বলে বিবেচিত হত। অথচ শুধু beats টাকে পাল্টে দেয়ায় , notes গুলোকে একটু অন্যভাবে লাগানোয় ওটাই হয়ে গেল কিনা একেবারে একালের আধুনিক গান। আসলে আমাদের চারপাশে জীবন যাত্রা আজকাল দিনকেদিন যেভাবে পাল্টে যাচ্ছে , আমাদের conventional musical instruments এর পাশাপাশি newly invented electronic musical instruments যেভাবে আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেক্ষেত্রে এখনকার মানসিকতায় আমাদের তথাকথিত রুচিসম্মত গানকে ভালো লাগাতে হলে , সেসব গানের treatment টা অবশ্যই modern মানসিকতার উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয় , যেকারণেই আজকাল এই যে beats য়ে এত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে , এই যে disco আসছে , এই যে নানান beats আসছে , I am always ready to welcome all these new ideas। ''ভূতবাংলোর '' সেই আও টুইষ্ট করে ......'' থেকে শুরু করে এই সেদিন গাওয়া ''কফি হাউসের সেই আড্ডাটা .....'' পর্যন্ত বিভিন্ন গানে নতুনের এই আহ্বানই বারবার আমি করেছি।

গান-বাজনায় আধুনিক মনস্ক বীট্‌স ইত্যাদির ব্যাপারেও আমি যেমন বরাবরই খুবই উৎসাহী ,তেমনি গানের কথার ব্যাপারেও আমি বরাবরই একটু কেমন যেন ভীষণ রকমের খুঁতখুঁতে প্রকৃতির লোক। গানের কথা, যুগোপযোগী শব্দ চয়ন , লেখার style. এসব ব্যাপার গুলো নিয়েও সবসময়ই আমি খুবই সচেতন ছিলাম এবং আমার জন্য যারা গান লিখতেন , যেমন পুলক, গৌরী , এদের সাথেও সবসময়ই এসব ব্যাপারে আমি প্রচুর আলাপ- আলোচনাও করেছি। পুলকবাবুকে তো সেসময় বহুদিন আমি বলেছি যে '' কী মশাই শুধু 'বাতায়ন', 'দীপ' ,বিজনপথ', তুমি চলে গেছো'' ইত্যাদি উনবিংশ শতাব্দি মার্কা শব্দ চয়ন ! একটু অন্যভাবে আজকের মতো করে লিখুন না, যেভাবে আরো practically as well as artistically প্রেমের কথা বলা হয়, সে ভাবে লিখুন না গান। তবে না নতুন কিছু করা যাবে।'' আর, এসব করতে হলে কোন গীতিকারের মধ্যে যে জিনিসটা থাকা, '' একান্ত বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ সমকালীন গানবাজনা শোনা,সে গুণটা পুলকবাবুর বরাবরই ছিল। সে সঙ্গে আমার নিজের যাদের গান শুনতে ভীষণ ভালো লাগে , যেমন মেহেদী হাসান সাহাব গোলাম আলি বা অন্যান্য শিল্পীরা , তাঁদের গানের কথা নিয়েও আমাদের মধ্যে প্রচুর আলোচনা হ'ত। এবং সে সব আলোচনার

ফলশ্রুতিতেই তৈরী হয়েছিল ' রাতে জাগা দুটি চোখ ', 'আমায় আকাশ বল্ল তোমার দু-চোখ ' বা " আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না " ইত্যাদি একটু ভিন্ন স্বাদের গান। গজলের ক্ষেত্রে শায়েরবা যেমন লেখেন -

"বাল বিখারকে টুটি কবরোঁপে
জব কোঈ মেহেজবীন রোতি হ্যায়
মুঝকো অখসর খ্যায়াল আতা হ্যায়
মৌত্ কিত্ নি হাসিন হোতি হ্যায়।" তেমনি বাংলা

গানের ক্ষেত্রে পুলকবাবুর লেখা " যে সমাধি বেদীটার ঠিক ওপরে ফুলন্ত গাছটা রয়েছে নুয়ে, ওখানে যে রয়েছে শুয়ে , তার ভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করি,তার ভাগ্যকে আমি ইর্ষা করি ......" গানটাও কী আমাদেরকে সেই একই অনুভূতির জগতে পৌঁছে দেয়না ! অথবা গৌরীবাবুর লেখা সেই বিখ্যাত গান -"ওগো বর্ষা তুমি ঝোরোনা গো অমন করে / কাছে সে আসবে তবে, কেমন করে / ....এলে না হয় ঝোরো তখন অঝোর ঝরে, যাতে , সে যেতে চেয়েও যেতে নাহি পারে ....." শুনতে শুনতে খুব সহজেই কি আমাদের মনে পড়ে যায়না বহুল পরিচিত সেই -" এ বাদল তু ইৎনা না বরস যো ও আ না সকে / ও আ যায়ে তো ইৎনা বরস ও যা না সকে " শায়েরীটিরও কথা ! ' কী দেখলে তুমি আমাতে" বা "শুনতে শুনতে অনেক কথাই সত্যি হয়ে যায় ' এসব গান গুলোও তো আসলে এককথায় বাংলায় লেখা গজলই। আর এসব গান লেখার ক্ষেত্রে পুলক বা গৌরীর flight of imagination . যে একটা নতুন মাত্রায় পৌঁছে গেছে, যেভাবে ওঁরা উপযুক্ত জায়গায় উপযুক্ততম শব্দটি ব্যবহার করেছেন , সে সব জিনিস গুলো আমাকে খুবই impress করতো and always I tried to honour their creation without any alteration . এবং এসব গানে সুর করার সময় বা এসব গান গাওয়ার সময় আমাকেও খুবই সতর্ক - সচেতন থাকতে হয়েছে , যাতে ওঁরা যে ভাবে কথাগুলো বলতে চেয়েছেন ,আমার উপস্থাপনায় তাঁদের সেই ভাবটা যেন পুরোমাত্রায় বজায় থাকে। গজলের ক্ষেত্রে যেমন শুধু সুর আর তালই নয় , সেই সঙ্গে কথাকে সেই বিশেষ মাত্রায় ধরাটাও যেমন একটা vital factor হিসেবে বিবেচিত হয় , মেহেঁদী হাসান সাহেবের গাওয়া " ক্যায়া টুটা হ্যায় অন্দর অন্দর " গানে "ক্যায়া" শব্দটা বলার মধ্যেই যেমন গানের পুরো ভাবমুর্ত্তিটা নিমেষেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে , " ক" ফোঁটা চোখের জল" বা " কী দেখলে তুমি আমাতে " ইত্যাদি গান গুলো গাওয়ার সময় আমিও খুবই চেষ্টা করেছি " ক' ফোঁটা", বা "কী দেখলে " ইত্যাদি শব্দকে বিশেষ মাত্রায় উচ্চারণ ও উপস্থাপন করে গানটাকে সেই বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে দিতে যেখানে 'কী' এর ভাবালু - আশ্চর্যবোধক আবেদনটা যেন সহজেই ছুঁয়ে আসতে পারে শ্রোতার অন্তরেরও অন্তরে থাকা স্পর্শকাতর সেই চিরকালীন প্রেমিক মনটাকে ।